এ কেমন বিধির বিধান!

যুথিকা বড়ুয়া

(সত্য ঘটনার অবলম্বনে)

মানুষের মন বড়ই খুঁতখুঁতে! কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে চায় না! বিশেষ করে মেয়েদের। কোথাও না কোথাও একটু আধটু ঘাটতি রয়ে যাবেই। যা প্রকাশ্যে আমরা স্বীকার করিনা। অথচ ভিতরে ভিতরে গুমড়ে মরি। যেমন, ইস্, গায়ের রঙটা আর একটু যদি পরিস্কার হতো! ফিগারটা যদি একটু টল হতো! আর একটু যদি স্লীম্ হতে পারতাম! কিংবা নাসিকা যদি আর একটু তিখালো হতো! এমন কত যে খুঁটিনাটি সমস্যায় লিপ্ত হয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের কাছে অপদস্থ হই, বিধাতার ওপর মনোক্ষুন্ন হই, তার ইয়ত্তা নেই! আর এই অপূর্ণতার কারণেই অযৌক্তিকভাবে একটা অভাববোধ অনুভব করি। যা মন থেকে কিছুতেই অপসারিত করতে পারিনা। অস্বস্তিবোধ করি। বিষন্নতায় ডুবে থাকি। আপসেট্ হয়ে পড়ি। মনবেদনায় কষ্ট পাই। আবার এও দেখেছি, অসন্তুষ্টির কারণে সৃষ্টি কর্তার কার্পণ্যতায় মানসিক রোগগ্রস্থ হয়ে সমগ্র লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে আড়াল করে রাখে অনেকেই!

আমার এক বান্ধবী ছিল, নাম কাকোলী। আমরা ওকে কোলী বলে ডাকতাম। ওর মুখাকৃতিটা ঠিক নেপালী মেয়েদের মতো। নাক চোখমুখ একেবারে ভোতা! নেই বললেই চলে! ওর ঠোঁটের একটু উপরে শুধু ছিদ্র দু'টোই দেখা যেতো। তাতেই নাকে নোলক পড়তো কোলী। লাল ফিতে দিয়ে মাথার ঝুটি বাঁধতো। যেমন কয়লার মতো কালো কুঁচকুচে গায়ের রঙ, তেমনি মুক্তোর মতো শুভ্র দন্তপংক্তি! দেখতে শাঁওতালী মেয়েদের মতোই লাগতো। কিন্তু তার মধ্যেও একটা লাবণ্যভাব ছিল কোলীর। যা ও' নিজেই জানতো না! কিন্তু হাইস্কুলের গন্ডি ছাড়ার পর প্রকাশ্যে কখনো ধরা দিতোনা। সবার অলক্ষ্যে চুপিচুপি গিয়ে নাইট কলেজ করতো। এছাড়া ঘর থেকে আর বেরই হতো না কোথাও! মনমরা হয়ে থাকতো। অথচ ওর মা-বাবার একটুও দুঃখ ছিলনা! দুইপুত্রের মাঝে কোলীই একমাত্র কন্যা! কত আদরের! ওনাদের ইচ্ছে ছিল, লেখাপড়া শিখিয়ে কোলীকে স্বাবলম্বী করে তুলবে! এম.বি.বি.এস. ডাক্তার বানাবে! জনতার সেবা করবে। যার চিকিৎসায় সুস্থ্য-সবল হয়ে উঠবে লাখো লাখো মানুষ। আত্মগর্বে মা-বাবার বুক ভরে যাবে। মুখ উজ্জ্বল হবে! এও কি কম সৌভাগ্যের কথা! অথচ একদিন তাদের আঙ্গিনাতেও যে সানাই বেজে উঠবে, বরযাত্রী আসবে, হাই-সোসাইটির মানুষজন আসবে, তা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি কোনদিন! যেন শাপে বর! কি আশ্চর্য্যজনকভাবেই ভাগ্যের চাকাটা ঘুরে গেল কাকোলীর।

শহরের এক বিশাল ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানীর মালিকানার একমাত্র উত্তরাধিকারী। অগাধ সম্পত্তির মালিক। পাত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা সাংসারিক কাজেকর্মে পারদর্শীতার নমুনা বা গুণবতী এবং সুদর্শণা না হলেও ধার্য করা হবে। পাত্রীপক্ষ নির্দ্বিধায় ওয়েল-কাম।

অপ্রত্যাশিত কাগজের বিজ্ঞাপনটা দৃষ্টিগোচর হতেই সুযোগটা হাত ছাড়া করলেন না কাকোলীর বাবা। ভাবলেন, মেয়ে আমার সুখে থাকবে। রাজরানী হবে। সম্ভ্রান্ত এবং আভিজাত্য পরিবারের কূলবধূ হবে। এর চাইতে তো আর কিছু আশাই করা যায়না!

এককথায় কোলীর বিয়ে পাকা করে ফেললেন চৌধুরী মশাই! শুনে আত্মীয়-স্বজন, পাড়ার লোক সবাই অবাক।-'এ আবার কেমন বিয়ে! পাত্র-পাত্রীর আলাপচারিতা হলো না। কেউ কারো মুখই দর্শণ করল না! পাত্র বোবা না কালা, না ল্যাংড়া! অন্ধও হতে পারে! না কি দোজবর! হাজার প্রশ্নের ভীড় জমে উঠল মানুষের মনে। নিশ্চয়ই কোনো গলদ আছে পাত্রের!'

দেখা গেল অনুমান মিথ্যে নয়! চেহারায় স্মার্ট, ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য তো দূর, পাত্রের পুরুষত্বই নেই! বড়লোক বাপের একমাত্র নিস্কর্মা হেবলাকান্ত পুত্র গোবরগনেশ। যার নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি ও ভালো-মন্দের বোধশক্তি এবং ব্যক্তিগত কোনো রুচীবোধই নেই, চেহারায় সতেজ-সজীবতা ও উচ্ছলতার লেশমাত্রও যার নেই, এমন ভাবলেশহীন, আবেগ-অনুভূতিহীন একটি প্রাণীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চাইতে আজীবন কুমারীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকাই ঢের ভালো। এ বিয়ে হতে পারেনা, কিছুতেই না! ছাদনাতলায় কাকোলী যাবেনা। হোক সে লগ্নভ্রষ্টা, কুলাঙ্গার! মা-বাবার মানহানী! দেখতে কালো কুৎসিত বলেই এতবড় ছলনা, অবিচার ওর সঙ্গে! গলায় দড়ি দিয়ে মরবে কাকোলী, তবু এমন অযোগ্য নির্বোধ নিস্কর্মা পাত্রের গলায় কখনোই মালা দেবে না সে!

শুনে হার্টএ্যাটাক হয় কোলীর বাবার। চেয়েছিলেন, কন্যার সুখ-সংসার। তার একমাত্র কন্যাকে সুপাত্রস্থ করতে পারলে মহাপ্রয়াণে শায়িত হলেও শান্তি! কিন্তু বিধিই বাম! বিয়ে গেল চূলোয়। সানাই-এর পরিবর্তে চৌধুরী বাড়িতে বেজে উঠল অমঙ্গলের সংকেত। প্রাণহানীর আশঙ্কা। প্রায় ছ'মাস মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বিপদমুক্ত হলেন ঠিকই কিন্তু বিছানায় শয্যাশায়ী পিতৃদেবের দূরাবস্থার অনুতাপে দ্বন্ধ হয়ে অবলীলায় হেবলাকান্ত অমিতের সঙ্গেই বিয়ের সম্মতি দিতে হলো কিন্তু দুর্ভাগ্য অমিতের, শুধু স্বামীত্বের আধিপত্যই নয়, স্ত্রীর হৃদয়পদ্মে জীবন-দেবতার আসনে ওর এতটুকু ঠাঁই হ'ল না। অথচ কি ধূমধাম করেই না শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হয়েছিল কাকোলীর! নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল, শহরের এম.পি, বিভিন্ন ধনী ব্যবসায়ী, আইনজীবি, ম্যাডিক্যাল ডাক্তার এবং নামিদামি আরো অনেকে।

কথায় বলে,-'অন্ধের কিই বা রাত, কিই বা দিন! অনুভব্যে রাত-দিন দুই সমান!'

ঠিক তাই! প্রাণহীন সংসার কাকোলীর। রূপ নেই। রঙ নেই। প্রাচুর্য্য নেই। নেই জীবনে চাওয়া পাওয়ার নতুন কোনো স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্খা! একরাশ অভিমান আর বেদনা নিয়ে একান্ত কামনা -বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, ভালোবাসার ইচ্ছানুভূতিগুলিকে গলা টিপে রেখে রুটিনমাফিক কেটে যাচ্ছিল, সংসার নদীর ভাটার টানে কাকোলীর নিরস নিস্প্রেম নিরানন্দের একঘেঁয়ে জীবন।

মানুষ পরিবর্তনশীল। সময়ের বিবর্তনে পৃথিবীর রূপ, রঙ যেমন বদলে যায়, ঠিক তেমনই সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে ঋতুর মতো বদলে যায় মানুষ। মানুষের জীবন। ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা। এটাই স্বাভাবিক।

ঠিক বছর পাঁচেক পর, একদিন কাকোলীর পতীদেব অমিতের আকস্মিক বিবর্তন রূপের দর্শণে শুধু বিস্মিতই নয়, অভিভূতের মতো কল্পনায় দেখতে থাকি, অতীতের সেই শিশুসুলভ আচরণের দৃশ্যগুলি। যার ধুতি-কুর্তা আর পায়জামাই ছিল পরিধানের একমাত্র বস্ত্র। না ছিল সুন্দর গুছিয়ে কথা বলার ঢং, না চলার ঢং! তো তো স্বরে কথা বলতো! তারই পরনে জিন্সের প্যান্ট, ডিস্কো শার্ট! চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের রঙ্গিন সান্গ্লাস! পায়েও ফ্যাশেনাবল্ দামী লেদারের হাইহিলের জুতো। মুখে জ্বলছে চুরুট। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে প্রসন্ন মেজাজে টানতে টানতেই নামল গাড়ি থেকে। একেবারে ভি.আই.পির মতো বুটের খট্খট্ শব্দ করে এগিয়ে যেতে লাগল শ্বশুড়বাড়ির দিকে। ওর পিছনেই কোলী। সিঁথিতে সিঁদুর। কপালে বড় একটা লাল টিপ। লজ্জায় রাঙা হয়ে হনহন করে হাঁটছে। বড়ই অবিশ্বাস্যকর ছিল সেই দৃশ্য! চেনার উপায় ছিল না অমিতকে! মনে মনে হিংসেও হাচ্ছিল বড্ড! ঐ তো রূপের ছিরি! মন মাণিক না হতেই কণ্ঠে মণিহার! এতখানি পরিবর্তন! সম্ভব হলো কি করে!

অমিতের উজ্জ্বল সুশ্রী গৌরবর্ণের মুখাকৃতিতে পৌরুষের আবির্ভাবে আভিজাত্যের গাঢ় ছাপটাও ছিল বেশ লক্ষণীয়। যা প্রতিটি মানুষকে অত্যন্ত চমৎকৃত করেছিল।

লোকে বলে,-'নারীর মমতামাখা কোমল স্পর্শ শুধু মধুময়ই নয়, মিরাকলও বটে! যার ছত্রছায়ায় একজন বিবাহিত পুরুষের সুখ আর মনের শান্তি সর্বদা বিরাজমান! যা বাইফোর্সে কখনো হাসিল করা যায় না।'

অনেকের ধারণা, কোনো ডাক্তার, কবীরাজ বা ওঝাবৈদ্য নয়, স্ত্রীর মধুর সান্নিধ্যেই বদলে গিয়ে ছিল, কোলীর হেবলাকান্ত নির্বোধ স্বামী অমিত। এই ভবের সংসারে অসম্ভবের যে কিছু নেই, তা প্রত্যক্ষভাবেই প্রমাণ করে দিয়েছিল কাকোলী। আনন্দে আত্মগর্বে মন-প্রাণ এবং হৃদয় নিংড়ানো সমস্ত ভালোবাসা কখন যে উজার করে ঢেলে দিয়েছিল, টেরই পায়নি! খুশীর প্লাবনে মুছে গেল কাকোলীর মনের পুঞ্জীভূত সমস্ত গ্লানি। এতো মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা কোথায় যে লুকিয়ে ছিল, ভাবেতই শ্বাশত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠত কোলীর মুখ। রাতভোর দুজনে স্মৃতির উপত্যকায় বসে শেষই হতো না হৃদয়-গহ্বরে জমে থাকা না বলা অজস্র কথা। পোহায়ে গিয়েছিল এমনিই কত বিনিদ্র রজনী! অথচ স্বপ্নেও কি ওরা ভাবতে পেরেছিল কোনদিন, জীবনের নতুন দিগন্তের নতুন আলোর এত আনন্দ-সুখ, হাসি-কলোতান রামধনুর মতো প্রেমাকাশে দেখা দিয়েই উধাও হয়ে যাবে!

সেদিন যথারীতিই প্যান্ট-শার্ট পড়ে অফিসে বেরিয়ে পড়েছিল অমিত। কিন্তু তখন খুবই ব্যস্ত ছিল কোলী। খেয়ালই করেনি! আসছে সপ্তাহে ওর ছোট ভাইয়ের বিয়ে। মা বলেছে,-'জামাইকে নিয়ে দুদিন আগেই রওনা দিতে! গোছ গাছ প্রায় শেষ। রাতটা পোহালেই কাল সকালের ট্রেনেই ওরা রওনা হয়ে যাবে।'

আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে হঠাৎ পিছন ফিরতেই দ্যাখে, চোরের মতো চুপিচুপি নৈঃশব্দে ঘুরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো অমিত। ঢুকেই বলিষ্ঠ বাহুদ্বয় প্রসারিত করে কোলীকে ওর উষ্ণ আলিঙ্গনে বেঁধে নিলো। ফিস্ ফিস্ শব্দে বলল,-'আজ রাতে আর ফিরবো না গো!'

বলেই কোলীর কপালে গালে চুম্বনে চুম্বনে ওকে একেবারে নাজেরহাল করে তুললো। আচমকা অমিতের এহেন অপ্রীতিকর আচরণে বিব্রোত হয়ে কোলী এক ঝটকায় ছিটকে বেরিয়ে আসে । অসন্তোষ হয়ে বলল,-'এ কি, করছটা কি! জানালা খোলা, দেখছ না! হঠাৎ হলো কি তোমার! ভীমরতি ধরল না কি!'

রেগে গেলে কোলীকে বেশ সুন্দর দেখায়। চোখের মণিদু'টি মৎচোক্ষুর মতো ফুলে ওঠে। দৃষ্টি ভ্রষ্টের মতো দেখায়। হাসি চেপে রাখা যায়না। তখন অমিতেরও পুরোনো বদঅভ্যাসগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হঠাৎ কোলীকে কাঁপিয়ে দিয়ে অট্টহাস্যে হেসে উঠল। ঠোঁটদুটো চিবিয়ে বলল, -'ওঃ মাই গড়! ঠাট্টাও কি বোঝনা!'

মুখে বুলি ফোটার পর ইদানিং কথায় কথায় হাসি-মজাক করাও খুব বেড়ে গিয়েছিল অমিতের। কিন্তু বাঙালি রমনীর মন! সর্বদা কু-ই গায়! ক্ষনিকের বিভ্রান্তিতে অসন্তুষ্ট হলেও অমিত বেরিয়ে যাবার পর থেকেই অজানা আশঙ্খায় বুকটা ওর বারবার কেঁপে উঠছিল। আজ কেন এমন হ'ল। আগে কোনদিন তো ঘটেনি! বিশেষ করে অফিস যাবার পথে! প্রার্থণা করে, -'হে ভগবান, রক্ষা করো ওকে। ও যেন সশরীরে ফিরে আসে বাড়িতে।'

অথচ তখন কি ভেবেছিল কেউ, অমিতের ঐ ঠাট্টা-রসিকতা সত্যি সত্যিই বিপদ ডেকে আনবে! ওদের সেদিনই শেষ দেখা!

কেটে গেল দু'দিন-দু'রাত। অমিত বেপাত্তা, নিখোঁজ। জলজ্যান্ত একটা মানুষ রাতারাতি উধাও হয়ে গেল কোথায়! ওর পরিবার-পরিজন চিন্তায় অস্থির সবাই! পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে কোলী! মুখে ভাষা নেই! চোখে ঘুম নেই! নাওয়া-খাওয়া নেই! মনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। চোখে বিভীষিকা। দুরাতেই শুকিয়ে গিয়েছে ওর চোখমুখ! একগাল পান চিবোতে চিবোতে কোলীর শ্বাশুড়ি বললেন,-'চিন্তা করো না বৌমা, আমার পোলারে তো জানি! শ্বশুড়বাড়িই গ্যাছে গিয়া! শ্যালকের বিয়া না, হ্যাড় তড় সয় নাই! দ্যাখবা, আইয়া পড়ব ক্ষণ!'

কিন্তু কোথায়! বড় ভাইকে একা গাড়ি থেকে নামতে দেখেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল কোলীর! এ কি! কোথায় অমিত! আসেনি তো! তবে কি সত্যিই কোলীর কপাল পুড়লো না কি!

হ্যাঁ সত্যিই তাই! অমিতের মৃত্যু সংবাদই বয়ে নিয়ে এসেছে কোলীর বড়ভাই। ওর চোখেমুখের উদ্বিগ্নতা দেখে কোলী চিৎকার করে ওঠে,-'এ আমার কি সর্বণাশ হলো দাদা! ওকে কেন আমি যেতে দিলাম! ওযে ফিরে এসেছিল! আমি যে একটুও বুঝতে পারিনি।'

বলতে বলতে বুক চাপড়ে হাউ হাউ করে মরা কাঁন্না কেঁদে উঠল কোলী। কিন্তু এতবড় একটা ঘটনা ঘটল কিভাবে, তা কেউই জানে না। পোষ্ঠ-মডেমের রিপোর্টে জানা গেছে, চলন্ত গাড়ির ধাক্কায় অমিতের মৃত্যু ঘটেছে। ছিটকে পড়েছিল নিটকস্থ গভীর জঙ্গলে। দিনের বেলায়ই নজরে পড়েনি কারো। কোলীদের বাড়ি থেকে ঠিক ত্রিশ কিলোমিটার দূরে! পোঁচে ফুলে দুর্গন্ধ্য ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় লোকজনেরা উদ্ধার করে অমিতের মৃতদেহ। থেতলে গিয়েছিল মুখ। রক্ত জমাট বেঁধে বীভৎস দেখাচ্ছিল ওর চেহারা। সনাক্ত করার উপায়ই ছিলনা! অমিতের এ্যাটাচিতে ছিল, কাকোলীর ভাইয়ের বিয়ের কার্ড। সেই কার্ডের ছাপা অক্ষরে লেখা ঠিকানা ধরেই পুলিশ গিয়ে হাজির হয় কোলীদের বাড়িতে।

একেই বলে নিয়তির নির্মম পরিহাস। রাজসিংহাসনে রাজারমুকুট পড়ে বসে থাকলেও অকাল বৈধব্যের দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এসে হৃদয়ের শূন্যতায় কাকোলীর আজও নীরব নীরবিচ্ছিন্ন একাকী নির্জন সন্ধ্যায় বুকটা খাঁ খাঁ করে ওঠে! মন কাঁদে। ওর প্রাণ কাঁদে। ভালোবাসা হারানোর শোকে -বেদনায় একান্ত নিঃভৃতে গুমড়ে গুমড়ে কেঁদে মরে আপন হিয়া। কখনো বা গভীর নিশীথে।

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডা প্রবাসী লেখিকা ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com